সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও পরিবেশভাবনা (১৮৫৫-১৯৬৪)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা শাখার ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

পার্থ মন্ডল

নিবন্ধনসংখ্যা- A00HI1501319

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক মহুয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৩

গবেষণা সন্দর্ভের বিষয় বিবরণী

পূর্বভারতের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা নিজেদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দৃঢ়তায় অনন্য নজির সৃষ্টি করে। ঔপনিবেশিকতার বন্ধনে ভারতবর্ষের অন্যান্য জনজাতি যখন দিশা হারিয়ে ফেলে তখন এই এলাকার সাঁওতালরা নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতিকে রক্ষার তাগিদে বিদ্রোহের পথকে বেছে নিতে পিছপা হয়নি, আর এই মানসিক দৃঢ়তার বলেই নিজস্ব ভূখণ্ড লাভ করে বিশেষ পরিচিতি পায়। তবে ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়পর্বে বিভিন্ন প্রতিকূলতা যেমন—ঔপনিবেশিক সরকারের নানান আইন-কানুন, মিশনারি ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব এবং স্বাধীনতা পরবর্তী নেহেরুর নেওয়া উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেগুলি তথ্যনিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে এই সময়কালে বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে সাঁওতাল জনজীবনে কী ধরনের ভাঙনের সৃষ্টি করেছিল, সেটিকে বুঝতে এই গবেষণা যথেষ্ট সাহায্য করবে।

বর্তমান গবেষণার শিরোনাম থেকে স্পষ্ট যে স্থান বা ভৌগোলিক ভূখণ্ড হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে সাঁওতাল পরগণাকে, কারণ এর পরিবেশগত দিকটি এই গোষ্ঠীর কাছে ছিল এক আদর্শগত স্থান। সাঁওতাল পরগণায় পাহাড়িয়া ব্যতীত অন্য কোনো জনজাতির বসবাস ছিল না। পাহাড় ও জঙ্গলময় এই এলাকাটির আদি বাসিন্দা ছিল পাহাড়িয়া জনজাতি। সাঁওতালরা এখানকার আদি বাসিন্দা ছিল না, বহিরাগত হিসাবে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে এই অঞ্চলে তাদের প্রবেশ ঘটে। অন্যদিকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে এই এলাকার নাম ও সীমানা বারবার বদলাতে থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই এলাকাটির নাম ছিল ‘জঙ্গলতরাই’। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে এলাকাটি ব্রিটিশ শাসকদের কাছে বাণিজ্যিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দস্যুপ্রবণ পাহাড়িয়াদের দমন করতে তৎকালীন বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস ৮০০ সৈন্যের দল পাঠান, আর তখন থেকেই এই এলাকায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৩৭ সালে ব্রিটিশ প্রশাসকরা এই এলাকাটির নামকরণ করে ‘দামিন-ই-কোহ’

(পাহাড়ের প্রান্তদেশ)। তবে এর দু-দশক পরে অর্থাৎ ১৮৫৫ সালে এই এলাকাটি 'সাঁওতাল পরগণা' নামে পরিচিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এই এলাকাটি বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, ২০০০ সালে বিহার থেকে আলাদা হয়ে 'ঝাড়খণ্ড' রাজ্যের অংশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে ১৭৯০-১৮২০ সালের মধ্যে সাঁওতালরা এখানে বহিরাগত হিসাবে বসতি স্থাপন শুরু করলেও ব্রিটিশ শাসকেরা তখন পর্যন্ত এই এলাকাটিকে পুরোপুরিভাবে সাঁওতালদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়নি। পাহাড়িয়ারা চাষবাসের প্রতি অনীহা দেখালে ১৮৩৭ সালে জেমস পনন্টেট 'দামিন-ই-কোহ'-কে সাঁওতালদের জন্য সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করে দেন। সাঁওতালরা ছিল সহজ, সরল ও পরিশ্রমী মানুষ। তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির দ্বারা পার্বত্য ও জঙ্গলাকীর্ণ এই এলাকাকে শস্য ও শ্যামলাময় করে তোলে। জল, জঙ্গল, জমি নির্ভর (Subsistence Economy) অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্র এক গ্রামীণ সমাজ কাঠামো গড়ে তুলেছিল। যেখানে ছিল মাঝি নির্ভর গোষ্ঠীবদ্ধ সমতাবাদী জীবন-যাপন প্রণালী, নিজস্ব লোকাচার-বিশ্বাস, উৎসব-অনুষ্ঠান, চিকিৎসা পদ্ধতি এবং নিজস্ব পরিবেশভিত্তিক মূল্যবোধ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হলেও সেখানে নারীদের যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হত।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সমগ্র পূর্বভারতের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু তখনও সাঁওতাল পরগণা বা তৎকালীন দামিন-ই-কোহ উক্ত ব্যবস্থার বাইরে ছিল। পাহাড়িয়াদের (সাঁওতাল পরগণার আদি বাসিন্দা) দমনের উদ্দেশ্যে তৎকালীন দামিন-ই-কোহতে সাঁওতালদের প্রবেশ ঘটে এবং ঔপনিবেশিক সরকারিই এক প্রকার সাঁওতালদের এই এলাকায় স্থায়ী বসবাস স্থাপন ও চাষের কাজে উৎসাহ দেয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অঞ্চলটিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতাই এসে পড়ে। একদিকে অর্থনৈতিক শোষণ এবং অন্যদিকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্যাতন, এই দুই এর সম্মিলিত ফলে সংগঠিত হয় ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ। শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও 'সাঁওতাল পরগণা' নামে ভূখণ্ড প্রাপ্তি সাঁওতালদের জাতিগত পরিচিতিকে বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক সরকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে সাঁওতালদের সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করতে থাকে, যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও বজায় থাকে।

আর এখান থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে মিশনারি ও হিন্দু সংস্কৃতির ভাবধারা গ্রহণ করায় সাঁওতালদের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ কাঠামো বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নতুন আঙ্গিকে পরিচালিত হতে থাকে, যা তাদের স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

গবেষণার ক্ষেত্র

গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে সাঁওতাল পরগনাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সাঁওতাল পরগণা ২৩০.৪০´ ও ২৫০.১৮´ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৬০.২৮´ ও ৮৭০.৫৭´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। জেলাটির মোট আয়তন ১৩৬৬.০১ বর্গমাইল যার মধ্যে ৫০০ বর্গকিমি অঞ্চল হল পাহাড়হীন এলাকা। সাঁওতাল পরগনার উত্তরে ভাগলপুর ও পুর্নিয়া। পূর্বদিকে মালদা, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম। দক্ষিণে বর্ধমান ও মানভূম। পশ্চিমে হাজারিবাগ, মুঙ্গের। এই ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে সাঁওতাল জনজাতির পরিবেশ সংক্রান্ত জীবন লক্ষ্য করা যায়। তাই এই অঞ্চলের ল্যান্ডস্কেপ (বাস্তুতন্ত্র) আলোচনায় এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিষয় সম্পর্কিত সাহিত্য পুনঃসমীক্ষা

যেকোনো গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যসম্পর্কিত পূর্ববর্তী পাঠগুলির বিশ্লেষণ ব্যতীত বর্তমান গবেষণার আবশ্যিকতা নির্ধারণ সম্ভব নয়। বিস্ময়ের বিষয় এইটি যে, সাঁওতালদেরকে কেন্দ্র করে যে বহুমাত্রিক ও বহু সংখ্যক ইতিহাস প্রবন্ধ, উপন্যাস ও ছোটোগল্প রচিত হয়েছে, তা ভারতের অন্য কোনো জনজাতি সম্পর্কে যথার্থই বিরল। আবার এই কথাও সত্য যে সাঁওতাল পরগণা সংক্রান্ত রচনা খুব বেশি উল্লেখের দাবি রাখে না। সম্ভবত বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং এই অঞ্চল ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের তুঙ্গ অবস্থায় পৌঁছানোয় তেমন গুরুত্ব পায়নি। বস্তুতপক্ষে ঔপনিবেশিক সময়কালে আদিবাসী বা সাঁওতাল জনজাতি সম্পর্কিত অধিকাংশ বিষদ আলোচনা (Discourse) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রশাসনিক আধিকারিক এবং খ্রিষ্টান মিশনারিরা সম্পূর্ণ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় আদিবাসী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ শুরু করে, উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় আদিবাসীদের ধর্ম, প্রথা ও সমাজ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ। তবে স্বাধীনতা উত্তরকালে আদিবাসী বা সাঁওতাল জনজাতি বিষয়ক বেশ কিছু

গ্রন্থ কয়েকটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ১৯৯২ সালে Sage, New Delhi থেকে প্রকাশিত হয় সুষান দেভলের *Discourses of Ethnicity : Cultures and Protest in Jharkhand.* এই লেখিকাই বলেন ঔপনিবেশিকরাই 'ট্রাইব' শব্দটির নির্মাণ করেন। বস্তুতপক্ষে ভারতের জনজাতিদের বিভিন্ন বৈচিত্র বহু পূর্ব থেকে বিদ্যমান ছিল। 'ট্রাইব' নামাঙ্কিত না হলেও এর বৈশিষ্ট্যগুলি এদের মধ্যে পুরো মাত্রায় উপস্থিত ছিল, কাজেই 'ট্রাইব' অভিধা পশ্চিমের সৃষ্টি একথা মানা যায় না। অবশ্য বিনয়ভূষণ চৌধুরি ও অজয় সাকারিয়া এই তত্ত্বের সমালোচনা করেন। মিনা রাধাকৃষ্ণান তাঁর *First Citizens : Studies on Adibasis, Tribals and Indigenous Peoples in India (২০১৬)* গ্রন্থে আদিবাসী নামকরণ নিয়ে এক বিতর্কের বিষয় সম্পর্কে অবগত করেছেন। জনজাতিদের কোন নামে চিহ্নিত করা হবে, ট্রাইব, আদিবাসী না ইনডিজেনাস। তবে ইনডিজেনাস শব্দটির আন্তর্জাতিক দ্যেতনা অনেক বেশি আর 'ট্রাইব' শব্দটি বহু পুরোনো। গ্রিক ভাষায় এর উল্লেখ হল 'ট্রাইবাস' নামে, বহু পরিবর্তনে এটি পৃথিবীর জনজাতিতে এসে সীমাবদ্ধ হয়েছে। আবার আদিবাসী মহাসভা গঠনের পর 'আদিবাসী' শব্দটি বিশেষ স্বীকৃতি পায় এবং পরবর্তী সময়ে জয়পাল সিং মুণ্ডা 'আদিবাসী' শব্দটিকে অধিকতর পরিচিতি দান করে। অন্যদিকে ইনডিজেনাস এর অর্থ হল 'নেটিভ' বা 'Born Within'. বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'ইনডিজেনাস পিপল' জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে আইনগত স্বীকৃতি পায়। ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সম্পন্ন জনজাতিগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল তারাই এই অভিধার অন্তর্ভুক্ত।

১৯৬০ এর দশকে F.G. Bailey এবং সুরজিৎ সিনহা 'Tribe-Caste Continum' তত্ত্বের কথা তুলে ধরেন। F.G. Bailey তাঁর *Tribe, Caste and Nation* গ্রন্থে (১৯৬০) উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি জাতিই এক সময় ট্রাইব বা আদিবাসী ছিল, অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ধারায় আদিবাসীরা কৃষক হয়েছে। এরই নাম দেওয়া হল Tribe-Caste Continum. আবার সুরজিৎ সিনহা তাঁর *Tribe-Caste and Tribe-Peasant Continua* (১৯৬৫) গ্রন্থে বলেন ভারতীয় জনজাতিরা জাতি, কৃষক এবং ট্রাইব হিসাবে একসাথে অবিরাম চলমান ছিল। তারা হিন্দু প্রভাবিত হওয়ায় এটি সংঘটিত হয়। আদিবাসী জনজাতির উপর হিন্দু ধর্মের প্রভাব এবং তৎপরবর্তীকালে

এদের মধ্যে ধর্মীয় পরিবর্তন এই গবেষণার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। ডি.এন. মজুমদার তাঁর *A Tribe in Transition* (১৯৩৭) গ্রন্থে এই সম্পর্কিত আলোচনাটি তুলে ধরেছেন। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক Mallinowski's দ্বারা ডি.এন. মজুমদার অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর মতে সামাজিক সংগঠনগুলি নির্দিষ্ট পরিবেশ এবং আদি সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা উচিত। হিন্দু সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি অর্থাৎ Accuturation এর ফলে আদিবাসী জনজাতির মধ্যে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতা অনেকটাই দায়ী। পরবর্তীকালে বিনয়ভূষণ চৌধুরি তাঁর 'Society and Culture of The Tribal World in The Colonial Eastern India : Reconsidering The Notion of "Hinduzation" of Tribes', in Hetukar Jha, *Perspective on Indian Society and History : A critique*, (২০০২) প্রবন্ধে আদিবাসীদের উপর হিন্দু প্রভাবকে অস্বীকার না করেও আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে আদিবাসীরা একদিকে শুদ্ধিকরণ এবং কৌশলগত দিক থেকে হিন্দু সমাজের কাছে ঋণী ছিল। অন্যদিকে এম.এন. শ্রীনিবাস তাঁর *Social Changes In Modern India* (১৯৬৩) গ্রন্থে Sanskritisation বা সংস্কৃতায়ন তত্ত্বের কথা বলেন। তিনি বলেন যে জনজাতিদের মধ্যে সব সময় উচ্চবর্গে উত্তরণের একটা প্রবণতা থাকে। Sanskritisation বা সংস্কৃতায়ন শব্দটি অবশ্য প্রথম ব্যবহার করেছেন ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এখানে তিনি আদিবাসীদের এক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। মার্টিন ওঁরাও তাঁর *The Santal : A Tribe In Search of a Great Tradition* (১৯৬৫) গ্রন্থে সাঁওতালদের সামাজিক চলমানতার উপরে ওঠার আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি তুলে ধরেন, যাকে তিনি 'Rank Concession Syndrome' বলে উল্লেখ করেছেন। আবার পশুপতি প্রসাদ মাহাতো তাঁর *Sanskritization vs Nirbakanization* (২০০০) গ্রন্থে বলেন, হিন্দু ধর্মের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আদিবাসীদের মধ্যে এক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের জন্ম দেয়, যাকে তিনি 'Nirbakization' বা 'Culture of Silence' বলে উল্লেখ করেছেন।

আদিবাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে কুমার সুরেশ সিং তাঁর দুখণ্ডে সম্পাদিত *Tribal Movement in India* (১৯৮৩) গ্রন্থে সর্বভারতীয় আদিবাসী ইতিহাসের কথা আলোচনা

করেছেন। তিনি এই আন্দোলনগুলিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে বর্ণনা দেন। প্রথম পর্যায় অর্থাৎ ১৭৯৫-১৮৬০ পর্যন্ত বিদ্রোহগুলিকে তিনি বলেছেন প্রাথমিক প্রতিরোধের আন্দোলন বা Primary Reistence Movement এবং এগুলির নেতৃত্বে ছিলেন আদিবাসী নেতারাই। যদিও প্রাথমিক প্রতিরোধ বলতে কী বোঝায় তা তিনি পরিষ্কার করেননি। দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ১৮৬০-১৯২০ পর্যন্ত যে আন্দোলন সেখানে লক্ষ্য করা যায় কৃষিগত, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি এবং এই নেতৃত্ব ছিল হয় কৃষক বা নয় শিক্ষিত আদিবাসীদের হাতে। ১৯২০-৪৭ পর্যায়ে আদিবাসী আন্দোলন অনেকটাই ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক রূপ পায়। সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রসঙ্গে সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের লিখিত সাঁওতাল *গণসংগ্রামের ইতিহাস* (১৯৭৬) গ্রন্থে। লেখক নিজে সাঁওতাল হওয়ায় বিদ্রোহ সংক্রান্ত আলোচনায় এই জনজাতির বিশ্ববীক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। সাধারণ কৃষক বিদ্রোহ ও আদিবাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে ১৯৮০-র দশকে যে বইটি সব চেয়ে বেশি আলোড়ন ও তাত্ত্বিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল, সেটি হল রণজিৎ গুহর *Elementary Aspect of Peasant Insurgency in Colonial India* (১৯৮৩)। গ্রামশির তত্ত্ব অনুসরণ করে রণজিৎ গুহ বলেন যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতের বিপরীতে আরো একটি আন্দোলন স্বকীয় রাজনৈতিক চেতনায় প্রতিভাত হয়েছিল। এর মধ্যে নীল বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহের পাশাপাশি সাঁওতাল ও মুণ্ডা বিদ্রোহ বিদ্যমান ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্বতন মূল্যায়নের সঙ্গে এর পার্থক্য এখানেই যে শ্রীগুহ এই বিদ্রোহে সাঁওতালদের এক স্বকীয় রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান করেছেন, যেখানে সেটি মূল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত বা অনুসারী নয়।

আদিবাসী ইতিহাস চর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি হল Abhay Flavian Xaxa ও G.N. Devy যুগ্মভাবে সম্পাদিত *Being Adivasi : Existence, Entitlements, Exclusion* (২০২১)। বিভিন্ন প্রবন্ধাবলির মধ্যে এই গ্রন্থে একদিকে উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ের সংবিধানের পঞ্চম তপশিলের (5th Schedule)-এর প্রভাব আলোচিত হয়েছে, অন্যদিকে বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে আদিবাসীদের সংহতির নানা জটিল সমস্যাগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে। এরই মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি হচ্ছে অর্চনা

প্রসাদের ‘Class Struggle and The Future of Adivasi Politics’. যেখানে তিনি শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে ভবিষ্যৎ আদিবাসী রাজনীতির সম্পর্কটিকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আলোকপাত করেছেন। স্বাধীনতা উত্তর আদিবাসী প্রশ্নে তার বক্তব্য হল যে, পঞ্চশীল নীতি অনুযায়ী আদিবাসী সংস্কৃতির সুরক্ষার কথা বলা হলেও মূল দ্বন্দ্বের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে তিনি আদিবাসী প্রতিরোধের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন এবং সেই সূত্রেই আদিবাসীদের মধ্যে শ্রেণি সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। আবার ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আদিবাসী স্বশাসন কতটা গ্রহণীয় সে সম্পর্কে এই গ্রন্থেই Vincent Ekka-র ‘Lessons from the Institution of Indigenous Self-Governance’ এই প্রবন্ধটি এক দিক দিশারি। যেখানে এক বিতর্কিত আলোচনার বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে ‘Adibasi Self Government’ বা ‘Indigenous Self Government’-এর কথা। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় রাজনীতির প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং আদিবাসী ধারণায় স্ব-শাসনিক গণতন্ত্র দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন আদিবাসী আন্দোলন যেমন ঝাড়খণ্ড, ভূমিসেনা, কাষ্ঠকোরি সংগঠন এবং সর্বপরি নকশাল আন্দোলনের মূল দাবি ছিল ‘Adibasi Self Government’ বা ‘Indigenous Self Government’.

বর্তমান গবেষণার সঙ্গে সাযুজ্যের দিকটি অর্থাৎ সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের ক্রম পরিবর্তনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে Surendra Prasad Sinha -র *Conflict and Tension In Tribal Society* (১৯৯৩) গ্রন্থে। প্রথমেই লেখক এই গ্রন্থে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের সঙ্গে কয়েকটি দ্বন্দ্বের উল্লেখ করেছেন। যেমন প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাঁওতালদের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, খ্রিষ্টান মিশনারি ও হিন্দুদের সঙ্গে এই জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের জটিলতা ও তার প্রভাব, পাশ্চাত্য শিক্ষাকেন্দ্রিক আদি সমাজের চাপা উত্তেজনা এবং এই অঞ্চলের ইউরোপীয় জমিদারদের সঙ্গে সাঁওতালদের দ্বন্দ্ব। এই সবেরই সামগ্রিক পরিণতিতে সাঁওতাল সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাঁওতাল বা আদি সমাজের সমতাভিত্তিক (Egalitarion) দিকটি আধুনিক গবেষণায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন। প্রথমা ব্যানার্জী তাঁর এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ‘Writing The Adibasi : Some Histrographical notes’ (The indian Economic and Social History Review, 53, 2016)-এ আদিবাসী সমতাবাদী

সমাজকে এক 'Myth' বা 'অতিকথা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, অথচ এর পূর্বে সাঁওতাল মণ্ডলীপ্রথাকে ব্যাখ্যা করে George E. Somers তাঁর *The Dynamics of Santal Traditions in a Peasant Society* (১৯৭৭) গ্রন্থে সাঁওতাল সমাজের সমতাবাদীর কথা উল্লেখ করেছেন। আদিবাসী পরিবর্তন বাহিকা সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ভার্জিনিয়াস জাক্সার *State, Society and Tribes : Issues In Post Colonial India* (২০০৮)। আদিবাসী সমাজের অবস্থানকে অস্বীকার করে উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে সমাজ, রাষ্ট্র ও জনজাতির পারস্পারিক সম্পর্কের টানা পোড়নকে কেন্দ্র করে আদিবাসী জীবনের যে বিভিন্ন মাত্রার পরিবর্তন তারই বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ এই বই। আবার সমগ্র ভারতীয় আদিবাসী পরিপ্রেক্ষিতে নন্দিনী সুন্দরের সম্পাদিত *The Scheduled and Their India : Politics, Identities, Policies and Work* (২০১৬) এই গ্রন্থের লেখাগুলি ভারতবর্ষের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী জীবন সম্পর্কে তত্ত্বগত ও তথ্যপূর্ণভাবে রচিত। এই উন্নয়নে আদিবাসীরা যে শুধুমাত্র স্বভূমি চ্যুত হয়েছে তাই নয়, হারিয়েছে তাদের অরণ্যের অধিকার। লেখিকা এরই পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসী বিদ্রোহগুলি পর্যালোচনা করেছেন। অন্যদিকে নির্মল সেনগুপ্ত সম্পাদিত *Fourth World Dynamics : Jharkhand* (১৯৮২) গ্রন্থে বিভিন্ন প্রবন্ধাবলির মাধ্যমে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন ও তার প্রভাব সম্পর্কে যেমন বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তেমনি ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের কারণ এবং আদিবাসী জনজীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। আর এইসব আলোচনার মাধ্যমেই পূর্বতন সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অবস্থান বিষয়ক একটা সম্মুখ ধারণা পাওয়া যায়। আদিবাসীদের দ্বারা অধুনা তাদের নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে। সাহিত্যিক উপাদান হিসাবে এদের মূল্য কোনো অংশেই কম নয়। সৌভেন্দ্র শেখর হাঁসদা লিখিত *Adibasi Will Not Dance*(২০১৫) এ রকমই একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মোট দশটি গল্প রয়েছে। আর এই গল্পগুলির মাধ্যমে লেখক আদিবাসী জনজীবনের বাস্তব প্রেক্ষাপটকে উপস্থাপিত করেছেন। ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী পরিবারগুলির মধ্যে আত্মমর্যাদা বিকাশের চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় যখন মঙ্গল মুর্মু ও তাঁর নাচের দল ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে নাচ দেখাতে অস্বীকার করে। স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়নে আদিবাসীদের যে কোনো লাভ হয়নি এবং আদিবাসীরা যে নির্বাচনী রাজনীতির

একটি সংখ্যা মাত্র থেকে গেছে, তা লেখক গল্পের ছত্রে ছত্রে তার বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন।

গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত উপরিক্ত আলোচনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাঁওতাল জনজাতিকে সর্বভারতীয় বৃহৎ প্রেক্ষাপটে বা বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে সাঁওতালদের আলোচনায় বেশিরভাগ বিষয় মূলত সাঁওতাল বিদ্রোহ কেন্দ্রিক। তাই একদিকে সাঁওতাল পরগণার (যা মূলত দুমকা, গোড্ডা, দেওঘর ও রাজমহল এই চারটি অঞ্চলকে নিয়ে গঠিত) সাঁওতাল জনজাতি বিষয়ক আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পায়নি, তেমনি সাঁওতাল বিদ্রোহের পরবর্তী সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের সমাজ-সংস্কৃতির ধারাবাহিক আলোচনার অপ্রতুলতা রয়েছে। তাই বর্তমান গবেষণায় এই বিষয়গুলিকে অনুধাবন করে তার ইতিহাসগত আলোচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় সম্পৃক্ত থাকায় বা সেই বিষয়গুলির আলোচনা ব্যতীত সমাজ সংস্কৃতিকে বোঝা সম্ভব নয়, সেগুলিকেও বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এই গবেষণায় সাঁওতাল জনজাতির নিজস্ব ভাষ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা এতদিন পর্যন্ত উপেক্ষিত থাকায় বা বোধগম্য না হওয়ায় সাঁওতাল বিষয়ক বহু ধারণার অস্বচ্ছতা ছিল।

গবেষণায় উত্থাপিত প্রশ্ন

১) সাঁওতাল পরগণা নামে নিজস্ব ভূখণ্ড লাভের পরেও কীভাবে সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি উপনিবেশ ও উপনিবেশ পরবর্তী কাঠামোয় আবদ্ধ হয়ে পড়ে?

২) ১৮৫৫ পরবর্তী পরিস্থিতি সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতির কোন কোন ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে?

৩) হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের ভাবধারা কীভাবে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতির গোষ্টীগত জাতি চেতনাকে প্রভাবিত করেছিল?

৪) সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনৈতিক সংকট এবং অভিপ্রয়াণ সাঁওতাল পরগণার জনসংখ্যার বিন্যাসকে কী প্রভাবিত করেছিল?

৫) স্বাধীন ভারতের নেহরুর আদিবাসী ভাবনা, উন্নয়নের প্রচেষ্টা ও সাংবিধানিক অধিকার কীভাবে সাঁওতালদের পরিচিতি সংকটকে ত্বরান্বিত করেছিল?

৬) সাঁওতালদের আত্মপরিচয়কে জাগ্রত করতে অলচিকি লিপির উদ্ভব কী ধরনের সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল?

৭) পরিবেশের সঙ্গে সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি কতটা সম্পৃক্ত ছিল এবং তার অবনমনেই বা কী প্রভাব পড়েছিল?

গবেষণা পদ্ধতি

আদিবাসী বা সাঁওতাল ইতিহাস রচনার পদ্ধতিগত দিকটি অন্যান্য ইতিহাস রচনার দিক থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। অন্যান্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে লেখ্যাগারের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও সাঁওতাল ইতিহাস চর্চায় লেখ্যাগারের বাইরে বা Beyond Archive কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কারণ আদিবাসীদের নিজস্ব কোনো লিখিত উপাদান না থাকায় লেখ্যাগার ভিত্তিক তথ্য বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে না। সরকারি আমলা ও মিশনারিদের দ্বারা সাঁওতাল মৌখিক ভাষ্যের লিখিত তথ্য থাকলেও তা অধিকাংশই পক্ষপাতদোষে দুষ্ট এবং প্রক্ষিপ্ত। তাই সাঁওতাল ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন বিন্তি বা পুরাণ, লোকসংগীত, ধাঁধা, হেয়ালি, রূপকথা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরই সঙ্গে আদিবাসী বা সাঁওতালদের মধ্যে আলাপচারিতা বা দলগত কথোপকথন (যা সাক্ষাৎকার নয়, কারণ সাক্ষাৎকারে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যেতে হয়। যা অনেক ক্ষেত্রেই নিরক্ষর গ্রাম্য আদিবাসীদের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে না বা হলেও সঠিক তথ্য উঠে আসে না।) এবং Participant Observation বা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ আদিবাসী বা সাঁওতালদের বিশ্ববীক্ষা ও মানসিকতার উপলব্ধিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। মূলত আদিবাসী বিদ্রোহগুলিকে সামনে রেখেই ঔপনিবেশিক সরকার বিভিন্ন রিপোর্ট বা প্রতিবেদন রচনা করে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় বিদ্রোহগুলির পটভূমির বর্ণনায় বিশেষত ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে সাঁওতাল সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, অভিপ্রয়াণ ইত্যাদি বিষয়গুলি উঠে এসেছে। গবেষণার কাজের তথ্য হিসাবে এগুলির

মূল্যায়নও সাঁওতাল ইতিহাস চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্যান্য নথি হিসাবে বিভিন্ন গেজেটিয়ার্স, সেনসাস্ রিপোর্ট ও মিশনারিদেরর বার্ষিক রিপোর্ট বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাই পদ্ধতিগত দিক থেকে একদিকে বিভিন্ন সরকারি প্রতিবেদনের মূল্যায়ন এবং অন্যদিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক তাদের জীবনচর্চা, এই দ্বিবিধ উপায়ই সাঁওতাল ইতিহাস রচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, আর সহায়ক উপাদান হিসাবে রয়েছে সাঁওতাল জাতি বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি সাঁওতালদের ইদানিং নিজস্ব লিপিতে (অলচিকি) রচিত নানান লেখাপত্রে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও অনালোচিত সাঁওতাল ইতিহাসের বহু তথ্য গবেষণার কাজকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যানগত বিষয়গুলির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণাটিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে তুলনামূলক, ঐতিহাসিক এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান গবেষকের সাঁওতালি ভাষা ও লিপি জ্ঞাত থাকায় সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষ্যের উপযুক্ত পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, যা গবেষণার কাজকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

গবেষণায় নির্ধারিত অধ্যায়ের রূপরেখ

গবেষণার বিষয়টিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে ভূমিকা ও উপসংহারের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে।

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : সাঁওতাল পরগণার গঠন, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্যশালী সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রশাসনিক ব্যবস্থা, মিশনারি ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব

তৃতীয় অধ্যায় : সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অভিপ্রয়াণ

চতুর্থ অধ্যায় : স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন ও সাংবিধানিক রীতিনীতি : ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

পঞ্চম অধ্যায় : সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবেশের প্রভাব

উপসংহার :

অধ্যায় বিবরণী

প্রথম অধ্যায় : সাঁওতাল পরগণার গঠন ও ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের পাশাপাশি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে সাঁওতাল জনজাতির উৎপত্তি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালদের বহিরাগত হিসাবে আগমনের ইতিহাস যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সাঁওতালদের স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতির নানা বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। তুলনামূলকভাবে এটাও আলোচিত হয়েছে যে সাঁওতাল পরগণার গঠনগত ও ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান সেখানকার সাঁওতাল জনজাতিকে অন্যান্য অঞ্চলের সাঁওতালদের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র করে তোলে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রশাসনিক, মিশনারি ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব আলোচিত হয়েছে। মূলত এই তিনটি বিষয়ই সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতির কাঠামোগত পরিবর্তনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সমগ্র পূর্বভারতের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু তখনও সাঁওতাল পরগণা বা তৎকালীন দামিন-ই-কোহ উক্ত ব্যবস্থার বাইরে ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অঞ্চলটিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতাই এসে পড়ে। একদিকে অর্থনৈতিক শোষণ এবং অন্যদিকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্যাতন, এই দুই এর সম্মিলিত ফলে সংগঠিত হয় ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ। শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও 'সাঁওতাল পরগণা' নামে ভূখণ্ড প্রাপ্তি সাঁওতালদের জাতিগত পরিচিতিকে বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক সরকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে সাঁওতালদের সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করতে থাকে, যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও বজায় থাকে। আর এখান থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে মিশনারি ও হিন্দু সংস্কৃতির ভাবধারা গ্রহণ করায় সাঁওতালদের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ কাঠামো বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নতুন আঙ্গিকে পরিচালিত হতে থাকে, যা তাদের স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

তৃতীয় অধ্যায় : সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থান এবং অভিপ্রয়াণের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। সাঁওতালদের অর্থনীতি ছিল মূলত জল-জঙ্গল-জমি কেন্দ্রিক। ঔপনিবেশিক সরকারের বিভিন্ন ভূমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে এবং জঙ্গল আইনের দ্বারা সাঁওতালদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিধ্বস্ত করার পাশাপাশি অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতির নানান ক্ষেত্রকে ভাঙ্গনের মুখে ঠেলে দেয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও উন্নয়নের ধারায় বৃহৎ কলকারখানা, বাঁধ নির্মাণ এবং বাণিজ্যিক জঙ্গল আইন সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। আর যার ফলে এখানকার সাঁওতালরা বিভিন্ন অঞ্চলে পরিযায়ী বা স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে অন্যত্র গমন করতে থাকে। অন্যদিকে উন্নয়নের সঙ্গী হিসাবে সাঁওতাল পরগণায় দিকুদের অনুপ্রবেশ ঘটে। যার সামগ্রিক ফলাফল হিসাবে সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায় : স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন ও সাংবিধানিক অধিকারের সঙ্গে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতে আদিবাসীদের স্থান কোথায়, তা নির্ণয়ে তৎকালীন বিতর্কগুলির আলোচনার পাশাপাশি নেহরুর পঞ্চশীল নীতির ব্যর্থতার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। সাঁওতাল পরগণায় বৃহৎ কলকারখানা, বাঁধ নির্মাণ করা হলেও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা তার সুফল পায়নি বরং তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে দুর্বিষহ করে তোলে। অন্যদিকে রক্ষাকবচ হিসাবে সাংবিধানিক নানান ব্যবস্থা থাকলেও তা সাধারণ আদিবাসী বা সাঁওতালদের অধিকারকে রক্ষা করতে পারেনি। আবার নির্বাচনী রাজনীতির দরুন সাঁওতাল সমাজ কাঠামোয় 'এলিট' শ্রেণির উদ্ভব তাদের গোষ্ঠী চেতনায় বিভাজন তৈরি করে। বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা সাঁওতালদের 'Traibal Self Government'-এর স্বতন্ত্র ভাবনা চিরতরে বিলীন হয়ে যায়। যার সামগ্রিক ফলাফল হিসাবে সাঁওতালরা স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে ঝাড়খণ্ডের দাবি করলেও তা শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাবধারায় পরিচালিত হতে থাকে। যেখানে সাঁওতালদের অধিকারের থেকে দিকুদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যার ফলস্বরূপ সাঁওতাল পরগণা কেন্দ্রিক সাঁওতাল জনজাতি তার স্বতন্ত্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পঞ্চম অধ্যায় : সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতির সমাজ সংস্কৃতিতে পরিবেশের প্রভাব আলোচিত হয়েছে। আদিবাসী বা সাঁওতালদের বিশ্ববীক্ষা মূলত প্রকৃতি তথা পরিবেশ-কেন্দ্রিক। তাদের সমাজ-সংস্কৃতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পরিবেশ রয়েছে কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। সাঁওতাল পরগণার পরিবেশ সেখানকার সাঁওতালদের বিশেষ স্বাতন্ত্র্যতা প্রদান করে। সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলটি ছিল মূলত জঙ্গল, পাহাড় ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। সাঁওতালদের বিভিন্ন উৎসব, গোষ্ঠী কাঠামো, ঔষধি ব্যবস্থা, গান-নাচ, সুর প্রভৃতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পরিবেশ তথা প্রকৃতি ছিল গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক। এমনকি পরবর্তীতে সাঁওতালদের অলচিকি লিপির উৎসও ছিল প্রকৃতি। প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবনবোধের পাশাপাশি প্রকৃতির সঙ্গে তাদের একটি সাংকেতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। দেওয়াল চিত্রের বিভিন্ন বিষয় এবং গাছের ডাল ও গাছের পাতার মাধ্যমে বার্তার অভিপ্রায়ের নির্দেশ মূলত প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবনবোধের অন্যতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু উপনিবেশ ও উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জঙ্গল আইন, বাঁধ ও কলকারখানা নির্মাণের দ্বারা সাঁওতালদের প্রকৃতি চেতনায় আঘাত নেমে আসে এবং শেষপর্যন্ত প্রকৃতি কেন্দ্রিক সমাজ ও সংস্কৃতি তার স্বতন্ত্র কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

গবেষণার সিদ্ধান্ত

সমগ্র ভারতবর্ষে সাঁওতালদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান মোটামুটি ভাবে এক হলেও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, আর এই পার্থক্যই আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অবস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, অন্যান্য অঞ্চলে সাঁওতালদের 'বাহা' পরব কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হলেও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের ক্ষেত্রে তা পৌষ মাসে উৎযাপিত হয়। আবার বিবাহের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের মধ্যে গাছের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ায় রীতি-রেওয়াজ থাকলেও একমাত্র ব্যতিক্রম সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের মধ্যে আমগাছের সঙ্গে বিবাহের রীতি, যাকে 'আমবিহা' বলা হয় এবং অন্যান্য অঞ্চলে সাঁওতালদের বিবাহ দুদিন যাবৎ করা হলেও এই অঞ্চলের সাঁওতালদের ক্ষেত্রে পাঁচ দিন ধরে করা হয়। মিশনারিদের দ্বারা সব থেকে বেশি

প্রভাবিত হয় এই অঞ্চলের সাঁওতালরা এবং অভিপ্রয়াণের পরিসংখ্যানে দেখা যায় এখানকার সাঁওতালরা সবথেকে বেশি স্থানান্তরিত হয়েছিল। এছাড়াও এই অঞ্চলের সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থান, খ্যাদ্যাভাস, চিকিৎসা পদ্ধতি, বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রণালীর মধ্যে অন্যান্য অঞ্চলের সাঁওতালদের থেকে বিশেষ পার্থক্য গড়ে তোলে। ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতা থেকে মুক্ত ছিল 'দামিন-ই-কোহ'। যা পূর্বতন জঙ্গলমহল বা সিংভূম অঞ্চলে জমিদারি অত্যাচার 'দামিন-ই-কোহ'-তে সাঁওতালদের অভিপ্রয়াণের সূচনা করে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার সাঁওতাল পরগণা সাঁওতালদের আদি বাসভূমি ছিল না, ব্যাপক অভিপ্রয়াণই এর জন্মদাতা। একই সাথে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব লাভের বিষয়টিও এর সঙ্গে সংযুক্ত। সাঁওতাল পরগণার আদি বাসিন্দা পাহাড়িয়ারা ঝুম চাষ ব্যতীত কৃষিকাজে আগ্রহী ছিল না, উপরন্তু এরা ছিল দস্যু প্রবণ। বিপরীত দিকে সাঁওতালরা ছিল শান্ত, কর্মনিষ্ঠ ও জঙ্গল হাসিলে দক্ষ। আর এই কারণেই কোম্পানি অনুমান করেছিল একমাত্র সাঁওতালদের দ্বারাই সম্ভব হবে পাহাড় ও জঙ্গলময় সাঁওতাল পরণার ভূমিতে কৃষিকাজের সম্প্রসারণ ঘটানো। তাই 'দামিন-ই-কোহ'-তে কৃষিকাজের ও স্থায়ী বসবাসের জন্য ঔপনিবেশিক সরকার সাঁওতালদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু যখন সাঁওতালরা এই অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস গড়ে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটায় তখন এই এলাকাটিকেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় নিয়ে আসা হয়; যার দরুন সাঁওতালদের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক কাঠামো, বিশেষ করে যৌথ মালিকানা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এরই প্রতিবাদে ১৮৫৫-৫৬ সালে সংগঠিত হয় ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ। তবে এই বিদ্রোহের জন্য বেশিরভাগ ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক কারণকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় বিভিন্ন তথ্যের নিরিখে দেখা যায় অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদাবোধের বিষয়টিও বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল। কেননা মণ্ডলী প্রথার ভাঙন, কামিয়তি ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি সাঁওতাল মেয়েদের আত্মমর্যাদার বিষয়টিও বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। যদিও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহে ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সাঁওতাল জনজীবনে নেমে আসে এক চূড়ান্ত বিপর্যয়। আর এরই ফলে এই জনজাতির সংহতিতে যে ভাঙনের সূচনা হয়, তারই

পরিণতিতে এদের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং পরিবেশ বাস্তবতায় দেখা দেয় বিভিন্ন পরিবর্তন।

সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করার পর এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ঔপনিবেশিক সরকার বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বিভিন্ন আইন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সাঁওতাল গ্রাম সমাজের স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায় যে সাঁওতাল সমাজ একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে বাধা পড়ে যায়। মাঝি বা গ্রাম প্রধানকে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও তাকে যুক্ত করা হয় ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে। আবার সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মাঝি বা গ্রাম প্রধানকে নামমাত্র পদে বহাল রেখে শুধু মাত্র তদারকির কাজ দেওয়া হয়, আর মূল ক্ষমতার প্রধান হিসাবে নিযুক্ত থাকে সরকারি আমলারা। শুধু তাই নয় ব্রিটিশদের পুলিশি ব্যবস্থা, কর সংগ্রহের পদ্ধতি, বিচার ব্যবস্থা সবগুলিই আরোপিত হয় সাঁওতাল সমাজের উপর। ১৮৫৫ সালের ৩৭নং আইনের ১নং ধারা অনুযায়ী সাঁওতাল পরগণাকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রবর্তিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে নন রেগুলেটেড জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হলেও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ভূমি রাজস্ব আইন ছাড়া সমস্ত আইনই এই এলাকায় পূর্বের ন্যায় বহাল রাখা হয়। তাছাড়া সমগ্র জেলাটিকে চারটি উপজেলায় বিভক্ত করে (গোড্ডা, দুমকা, দেওঘর, রাজমহল) এক জন করে অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। ফলত, পূর্বের মাঝি, পরগনাইৎদের জায়গায় সরকার নিযুক্ত কর্মকর্তা ও আধিকারিকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু তাই নয় সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের স্বার্থ রক্ষার্থে একাধিক ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আইন প্রবর্তন করা হলেও সাঁওতালরা বিশেষভাবে লাভবান হয়নি। এই সমস্ত আইনে সাঁওতাল গ্রামসভার পরিবর্তে পূর্বের ন্যায় জমিদার ও ব্রিটিশদের ক্ষমতা বহাল থাকে এবং দেশীয় জমিদারদের তালিকায় নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় ইউরোপীয়রা, যারা খাজনা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিয়েছিল। অন্যদিকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকার দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় সাঁওতালদের 'ল-বির-বাইসি' (উচ্চতম সভা)–এর মতো স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙে পড়ে। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের আবগারি নীতি, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের মতো আইন

সাঁওতাল সমাজকে তার ঐতিহ্যপূর্ণ শিকার উৎসব, হাঁড়িয়া পান থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে। আবার স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সাঁওতাল ঐতিহ্য অনুসরণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হলেও বাস্তবে দেখা যায় ব্রিটিশদের প্রবর্তিত আইনগুলিই নতুনরূপে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে সাঁওতাল সমাজ কাঠামোর স্বাতন্ত্র্য বিঘ্নিত হয়ে Tribal Self Government (TSG) থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

Tribal Self Government (TSG) বা সাঁওতাল স্ব-শাসন ছিল মূলত জমি ও জঙ্গল ভিত্তিক। এক্ষেত্রে রাজনীতি অর্থনীতিকে নয় বরং অর্থনীতি রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এখানেও লক্ষ্য করা যায় আদিবাসী জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হলেও সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত হয়নি, আর কিছু ক্ষেত্রে রূপায়িত হলেও তার সুবিধা ভোগ করে বহিরাগত দিকুরা। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা গুরুত্ব সহকারে প্রবর্তন করা হয়েছিল সেগুলি সাঁওতাল পরগণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদাসীনতার সঙ্গে করা হয়। তাছাড়া এই অঞ্চল ছিল খনিজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ, তাই ঔপনিবেশিক সময় থেকেই এই সব অঞ্চলে বৃহৎ শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। আবার এই বৃহৎ শিল্প এবং শিল্পের পরিকাঠামো নির্মাণে বৃহৎ পরিমাণ সাঁওতাল জমি অধিগৃহীত হয়, আর এই জমিচ্যুতি সাঁওতালদের অর্থনীতিতে যে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে এনেছিল তারই ফলস্বরূপ শুরু হয় তাদের এক ব্যাপক অভিপ্রয়াণ। নিজ বাসভূমি থেকে শুধুমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার্থেই তাদের চলে যেতে হয় পার্শ্ববর্তী জেলা এবং খনি অঞ্চলে। এদের অভিপ্রয়াণের পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় অভিপ্রয়াণের দিকগুলি ছিল মূলত বীরভূম, পশ্চিম-দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদা, আসাম, সুন্দরবন প্রভৃতি। আর এই সব অঞ্চলে সাঁওতালরা মূলত স্বল্প মজুরির শ্রমিকের কাজে যুক্ত হয়। নিজেদের আত্মনির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামোর বুনিয়াদ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক হিসাবে নিজেদের যুক্ত রাখা আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে। যদিও স্থানান্তরিত সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা নিজেদের কর্মদক্ষতা ও আত্মমর্যাদার প্রশ্নে বিশেষ দৃষ্টান্ত রাখে। অনুসন্ধানে প্রমাণিত যে, একদিকে বীরভূমে তাদের অভিপ্রয়াণে যেমন কৃষিকাজের সম্প্রসারণ ঘটেছিল

তেমনি সুন্দরবন অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করে লোকালয় গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আবার আত্মমর্যাদার প্রশ্নে মালদায় জিতু সাঁওতালদের বিদ্রোহ (১৯৩২) ও আরো পরবর্তীকালে নকশালবাড়ি (১৯৬৭) অভ্যুত্থান একদা সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতির অভিবাসনে পরবর্তী প্রজন্মের অবদান। তবে এই অভিপ্রয়াণের সামগ্রিক ফলাফল হিসাবে একদিকে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের জনবিন্যাসের যেমন পরিবর্তন ঘটতে থাকে তেমনি অন্যদিকে সাঁওতালদের সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন প্রভাবিত হতে থাকে।

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর পরিবর্তনে খ্রিষ্টান মিশনারি এবং হিন্দু ধর্মের প্রভাবের এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ সরকারের পরোক্ষ নীতির বাহক ছিল মিশনারিরা। ঔপনিবেশিক সরকারের কাঠামোকে মজবুত করতে মিশনারিরা ধর্মান্তকরণের মধ্য দিয়ে আদিবাসী বা প্রান্তিক মানুষদের পশ্চিমী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। মিশনারিদের ধর্মান্তকরণের প্রচেষ্টার মূল স্বার্থটি ইতিহাসের অসচেতন অস্ত্র হিসাবে এই জনজাতির শিক্ষা বিস্তারে এবং স্বাস্থ্য সচেতনতায় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল, যা পরবর্তীকালে তাদের রাজনৈতিকভাবে অভিষিক্ত করে। উনিশ শতকের পূর্বে সাঁওতালি ভাষাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখা হলেও মিশনারিদের প্রচেষ্টাতেই এই ভাষা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে এবং মিশনারিদের দ্বারাই সাঁওতালি ভাষার লিপিবদ্ধকরণ সম্ভব হয়েছিল। যার দরুন পরবর্তীতে সাঁওতালি লিপির উদ্ভব এবং সাঁওতালি ভাষার সাংবিধানিক অধিকার লাভের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। তবে এই ইতিবাচক দিকগুলির পাশাপাশি যে নেতিবাচক দিকগুলি সাঁওতাল সমাজে ভাঙনের সূত্রপাত ঘটায় সেটিও মিশনারিদের দ্বারাই সংঘটিত হয়। মিশনারিরা সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের গোষ্ঠীগত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি থেকে উৎখাত করে নতুন একটি সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ছেড়ে দেয়। সাঁওতালদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থাকে হাতিয়ার করে মিশনারিরা নানান প্রলোভন দেখিয়ে সরকারের বাণিজ্যিক স্বার্থে সাঁওতালদের অভিপ্রায়ণে উৎসাহ প্রদান করে। আবার মিশনারি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সাঁওতালরা তাদের ঐতিহ্যের নিদর্শন যৌথ নৃত্য, গান থেকে যেমন বিরত থাকত তেমনি সাঁওতাল ঐতিহ্যমণ্ডিত দেওয়াল চিত্রের পরিবর্তে খ্রিস্টের

পরিচায়ক ‘ক্রস চিহ্ন’ আঁকতে বাধ্য থাকত। মিশনারিদের এই সমস্ত কার্যকলাপে গোষ্ঠীবদ্ধ সাঁওতাল সমাজ বিভক্ত হয়ে পরে, যার প্রভাব এসে পড়ে তাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে। সাঁওতাল সমাজ কাঠামোকে বিভক্ত করে যে রাজনৈতিক বাতাবরণ গড়ে ওঠে, তা পরবর্তীতে আরো জটিল রূপ ধারণ করে। এই দলাদলি রাজনৈতিক বাতাবরণ পরবর্তীতে সাঁওতালী ভাষা ও অলচিকি লিপির বিস্তারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং স্বাধীনতার পরেও সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্মের উল্লেখ না পাওয়াও এর অন্যতম কারণ। তাছাড়া মিশনারিদের প্রভাবেই সাঁওতালদের ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতির স্থান নিয়েছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। ফলত সাঁওতালদের স্বতন্ত্র চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন বিবর্তিত হয়েছে তেমনি ভেষজ সংগ্রহের পদ্ধতিও তারা ভুলতে বসেছে। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মের প্রভাবে সাঁওতাল সমাজ অনেকাংশেই পরিবর্তিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক জি.এস.ঘোরে আদিবাসীদের নিম্নশ্রেণির হিন্দু বলে অভিভূত করলেও এই মতের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলি উঠে আসে সেগুলি হল সাঁওতাল সমাজের একাংশ তাদের নিজস্ব ধর্মের প্রভাব থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন হয়নি। জড়োপাসক সাঁওতালরা মূর্তিপুজার দিকে কিছুটা অগ্রসর হলেও তাদের প্রধান দেবতা মারাং বুরুকে অস্বীকার করেনি। তবে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা ১৮৭১ সালের ‘খেরওয়াড়’ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে হিন্দু ধর্মের নানান প্রতীক ও আচরণ বিধিকে গ্রহণ করেছিল। আবার ‘সাপাহড়’ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে শুদ্ধিকরণের ভাবধারা গড়ে ওঠে তাতে ধর্মান্তরিত সাঁওতালরা নিজেদের সমাজের ঐতিহ্যের নানা বিষয়কে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখতে থাকে এবং শুদ্ধিকরণের নামে স্ব-সমাজের নানা বিষয়কে উৎখাত করার চেষ্টা করে। শূকর, মুরগি পালন এবং হাঁড়িয়া পানের মতো বিষয়গুলিকে অশুচি হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়, অথচ এই বিষয়গুলি ছিল সাঁওতাল গ্রামসমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি। হিন্দুত্বের এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যে গোষ্ঠীবদ্ধ সাঁওতাল সমাজ বিভক্ত হয়ে পরে। তাছাড়া বহিরাগত হিন্দুদের দ্বারায় যে মাঝি প্রথা ধ্বংস হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থনৈতিক দিক থেকে যেমন ‘Tribe-Caste Continuum’-এর কথা বলা যায়, তেমনি হিন্দুত্বের প্রভাবের ক্ষেত্রে ‘Hindu-Tribe Dichotomy’-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে আদিবাসী উন্নয়ন সংক্রান্ত ভেরিয়ার এলুইন এবং নেহরুর বিতর্কটি যেমন উল্লেখিত হয়েছে তেমনি আদিবাসীদের অবস্থান বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। আদিবাসীদের অবস্থান বিষয়ক বিতর্কে মূলত পৃথকীকরণ ও সংযুক্তিকরণের মতো দুটি বিষয় উঠে আসে, কিন্তু কার্যত শেষ পর্যন্ত কোনো নীতিই সঠিকভাবে আদিবাসীদের অবস্থানের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি। নেহরুর পঞ্চশীলে আদিবাসীদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সংরক্ষণের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মূল সমস্যাটি ছিল মূলত অর্থনৈতিক। সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সংস্কৃতির পরিবর্তনও অনিবার্য। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী তথা সাঁওতালদের আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে বাস্তবে এক বিপরীত চিত্রের প্রকাশ ঘটেছিল। জাতীয় মূল স্রোতের সঙ্গে তাদের যুক্ত করার যে ব্যর্থতা সেটি মূলত নীতি নির্ধারকদের মধ্যেই নিহিত ছিল। উন্নয়ন বিষয়ক আদিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো প্রতিফলন এই নীতিগুলিতে পরিলক্ষিত হয়নি। আমলাতান্ত্রিক অনিহা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া পরিকল্পনাগুলির বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে বহু প্রতিবন্ধকতা ছিল। উহাদরণস্বরূপ বলা যায়, জমি হস্তান্তর এবং অরণ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আইনত গ্রামসভাগুলির অনুমতির প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কার্যত দেখা যায় বৃহৎ শিল্প কারখানা, খনি অঞ্চলে জমি অধিগ্রহণ এবং অরণ্যের উপর অধিকার হস্তচ্যুত হয়ে থাকে। সংবিধানে সংরক্ষণের যে সুবিধাগুলি ছিল সেগুলি গ্রহণ ক্ষমতার জন্য সাঁওতাল অর্থনীতি ও শিক্ষার যে বুনিয়াদ তৈরির প্রয়োজন তা সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯৫২ পরবর্তী ৩০ বছরে ৪.৩ মিলিয়ন অরণ্য জমি, ভারীশিল্প এবং পরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। সন্দেহ নেই যে সর্বজনীন ভোটাধিকার আদিবাসী বা সাঁওতালদের রাজনৈতিক সচেতনতা স্বল্প হলেও বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু এর সুফল প্রধানত গ্রহণ করেছিল সাঁওতাল জন সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সাঁওতালরা এবং এদের মধ্যেই গড়ে ওঠে সাঁওতাল সমাজের মধ্যে এক 'এলিট' শ্রেণির, যারা স্ব-সমাজকে অবহেলা করে হিন্দু উচ্চ শ্রেণির সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। জয়পাল সিং মুণ্ডা বা শিবু সরেন এরা সবাই ছিলেন সাঁওতাল সমাজের অগ্রবর্তী শ্রেণি এবং এরাই মূলত সাঁওতাল সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। অন্যদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়নের ব্যর্থতা থেকে পুনরায় Self Government-এর দাবি ওঠে, আর এই ভাবনা

থেকে গড়ে ওঠে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন। কিন্তু ঝাড়খণ্ড গড়ে উঠলেও সেখানে 'এলিট' আদিবাসী এবং হিন্দুদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সাধারণ আদিবাসীরা সব দিক থেকেই বঞ্চিত থেকে থেকে যায়।

সাঁওতালদের ক্ষেত্রে পরিবেশগত সম্পদগুলি কেবলমাত্র পরিচয়ই নই, তাদের অস্তিত্বের নিদর্শন। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনীতির মূলভিত্তিই হল জল, জঙ্গল ও জমি। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই নয়, পরিবেশের সঙ্গে সাঁওতালরা জড়িয়ে আছে সংস্কার ও সংস্কৃতিভাবে। অনুসন্ধানে দেখা যায় অরণ্য, নদী পর্বত সব কিছুই সাঁওতালদের দেবতা এবং তাদের সৃষ্টি তত্ত্বের আখ্যান, গোত্রের নাম-প্রতীক সব কিছুই প্রকৃতিকেন্দ্রিক। আবার প্রকৃতির সঙ্গে তাদের একটি সাংকেতিক সম্পর্ক বিদ্যমান, যার প্রতিফলন দেখা যায় সাঁওতাল দেওয়াল চিত্রে এবং লিপির গঠনের মধ্যে। এছাড়াও তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গাছ-গাছালির ওপর নির্ভর করে। সাঁওতালদের নাচ, গান, সুরের সৃষ্টির মূলেও রয়েছে প্রকৃতি। শুধু তাই নয় সাঁওতালদের 'জাহের থান' হল প্রকৃতি বন্দনা বা সংরক্ষণের অন্যতম নিদর্শন। তবে সাঁওতালদের পরিবেশ কেন্দ্রিক জীবন বোধের বিচ্ছেদ ঘটে ঔপনিবেশিক সময় থেকে। সমগ্র ভারতবর্ষের মতোই সাঁওতাল পরগণাতে পরিবেশ ধ্বংসের সূচনা ঔপনিবেশিক আমলেই। দুর্ভাগ্যবশত, স্বাধীন ভারতের পরিবর্তিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বহন করে চলেছে একই উত্তরাধিকার। উন্নয়নের অভিধায় সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও আদিবাসীদের সুরক্ষিত মনোভাবের মধ্যে বিরাজিত যোজন প্রমাণ দূরত্ব। ১৮৭৬ সালে প্রথম সাঁওতাল পরগণার ৭৬ বর্গকিমি বনাঞ্চলকে সুরক্ষিত ঘোষণা করা হয় এবং ১৮৭৮ সালে বন আইনের VII নং তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার ১৯০৪ সালে হাজারিবাগ থেকে পৃথক করে সাঁওতাল পরগণা বনবিভাগ গঠন করা হয়। এই সব আইনের দ্বারা সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় এবং যার ফলাফল হিসাবে সাঁওতাল অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলি সংকচিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জাতীয় অরণ্য নীতিকে রাজস্ব সংগ্রহের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শাল গাছের পরিবর্তে বাণিজ্যিক গাছ লাগানোর জোর দেওয়ায় সাঁওতালদের অর্থনীতির পাশাপাশি সমাজ সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়ে। সেই

সঙ্গে উন্নয়নের নামে সাঁওতাল পরগণায় বৃহৎ কলকারখানা, বাঁধ, জলাধার, সড়ক ও রেলপথ নির্মাণে সাঁওতালদের বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয় ঘটতে থাকে। এই সমস্ত কারখানা ও খনি অঞ্চলের দূষণে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের স্বাস্থ্যের যেমন অবক্ষয় দেখা দেয় তেমনি সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতির নানান নিদর্শন বিশেষ করে সাঁওতাল দেওয়াল চিত্রগুলি কারখানার ধুলো ও ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যায়। সুতরাং পরিবেশের অবনমনের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল সমাজ- সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

ইতিহাস এক চলমান পরিবর্তনশীল আখ্যান। নিরন্তন ভাঙা গড়ায় ঘটে চলে তার আবর্তন; যদিও আঙ্গিক এক থাকে না। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভাঙনের পাল্লা যখন ভারী হয়ে দেখা দেয়, তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে অতীতের দিকে ফিরে দেখা এবং পুনর্গঠন করা। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের সম্প্রদায়গত সংহতি এবং সংস্কৃতি যখন বিপন্ন তখন বিকল্প হিসাবে উঠে আসছে 'সারনা' ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপরিচয়ের মাধ্যম হিসাবে সার্বিক ভাবে অলচিকি লিপির প্রবর্তনের দাবি। এগুলির যুগোপযুগিতা সন্দেহাতীত না হলেও তারা নিজেদের পরিসরকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে এক ধরণের পুনঃআদিবাসীকরণের (Re-Tribalizaton) পথে হাঁটতে চাইছে। এরই প্রকাশ বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব। যেমন— পশ্চিমবঙ্গে কুর্মি মাহাতো ও সাঁওতাদের দ্বন্দ্ব। আবার সাঁওতাল পরগণার মূল দ্বন্দ্ব বহিরাগত ও আদিবাসী-সাঁওতালকেন্দ্রিক, এছাড়াও রয়েছে খ্রিষ্টান সাঁওতালদের সঙ্গে মূল নিবাসী সাঁওতালদের দ্বন্দ্ব। ইতিহাসে শেষ কথা বলে কিছু হয় না, তাই আমাদের গবেষণায় ১৮৫৫-১৯৬৪ পরিসর অতিক্রম করে এই সব দ্বন্দ্বের পরিণতি ভবিষ্যতের কি বার্তা বহন করে আনবে সেটি বস্তুত পক্ষে অজ্ঞেয়।

গ্রন্থপঞ্জি

PRIMARY SOURCES

A. ARCHIVAL SOURCES:

1. West Bengal State Archives, Kolkata

Bengal Board of Revenue proceedings, 1793-1840.

Bengal General(Mic) Proceedings, September 1875, BJP, File No.133-1/4 Bhagalpur Commissioner's Annual General Report 1874-75.

Proceedings of the Judicial Department, Government of Bengal, 1855, 1856, 1862, 1865, 1867, 1870, 1871, 1881, 1896.

2. Bihar State Archives, Patna

Bhagalpur commissioner's Records: Damin-I-Kor correspondences, 1827-1852.

Fortnightly Reports, Bhagalpur 18/1933.

Proceedings of the Governor General in Council in their Revenue Department, 6th January, 1775-1785.

Proceedings of the Judicial Department, Judicial Branch, Government of Bihar and Orissa, 1882, 1905, 1937.

Proceedings of the Political (Special) Department, Government of Bihar and Orissa, 1927, 1929, 1930, 1931, 1933, 1935, 1936, 1938, 1942.

Political Special; File KW 20/1931; DIG CID Report July-December 1931.

Reports DIG CID File number KW 20 1935; January -December 1935.

3. Jharkhand State Archive, Ranchi

Annual Administration Reports roads and buildings irrigation and Railways, 1922-23, 1924-25

Proceedings of the hon'ble the lieutenant governor of Bengal in Council during general department education, 1912.

Report on the land revenue administration of the province of Bihar and Orissa, 1918, 1919, 1920.

The Chotanagpur tenancy (Amendment bill 1920 and referred to their report, 1920).

4. Dumka Record Office (erstwhile Santal Parganas, now at Jharkhand)

Letter copy book (Not systematically arranged), Several Volumes, 1840-1932.

Pontet's Correspondence Book.

5. National Archive of India, New Delhi

Proceedings of the Home Department, Judicial, 1861, 1871, 1872.

B. OFFICIAL DOCUMENTS

1. Census Publication

Archer, W.G., Census of India 1941 Volume VII, (Public Department, 1942)

Beverley, H., Report on the Census of Bengal, Volume II, 1872, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1872.

District Census Report, Santal Parganas, 1891, Bengal Secretariat Press, Calcutta,1892.

Hutton, J.H., Report on the Census of India, 1931, 3 Volumes, Gyan Publishing House, New Delhi, 1966.

Risley, H.H., and Gait, Report on Census of India, volume VI, 1901, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1903.

2. Gazetteers, Settlement Report and Other Government Reports

Gazetteers :

Bihar District Gazetteers : Santal Parganas, Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965.

O' Malley, L.S.S., Bengal District Gazetteers: Santal Pargana, First Published 1910, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984.

Settlement Report :

Craven, J, Final Report on the Suvey and Settlement of Certain Estates in Santal Parganas, 1888-92. Bengal Revenue Proceedings Vol – 4330, March 1893.

Final Report on the Suvey and Settlement of Certain Estates in Santal Parganas, 1892-94. Bengal Revenue Proceedings Vol – 5695, May 1899. Copy also in the Deputy Commissioner's Record Room, Dumka.

Gantzer, J.F., Final Report on the Suvey and Settlement Operation in the District of Santal Parganas 1922-1935, Superintendent Government Printing, Bihar, Patna, 1936.

Mc. Pherson, H., Final Report on the Suvey and Settlement Operation in the District of Santal Parganas 1898-1907, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1909.

Wood, Brown, Final Report on the survey and settlement of the Damin-i-koh (1878-79). Bengal Revenue Proceedings, Vol – 1488, May 1880. Also in Deputy Commissioner's Record Room, Dumka.

Other Government Reports Printed and Publication

Datta, K.K., (ed.) Selection from unpublished correspondence of the Judge Magistrate and the Judge of Patna (1790-1857).

Datta, K.K., (ed.) Selection from the Judicial Records of Bhagalpur District Office (1772-1805), State Central Record Office, Patna, 1968.

Enquiry Report of Mr. H.C. Sutherland, Magistrate of Bhagalpur entitled "Report on the management of the Rajmahal hills dtd 8th june 1819", West Bengal State Archives, Calcutta, also in Deputy Commissioner's Record Room, Dumka.

Prime Minister's speeches, August 1955, Verrier Elwin Papers, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi

First Five-Year Plan in Bihar 1951-56, A Review, Printed by the Superintendent, secretariat Press, Bihar, Patna, 1956.

Mac Donnel, A.P., Report on the food grain supply : A statistical review and relief operations in the District of Bihar and Bengal during the famine of 1873-74, Government of Bengal, Calcutta, 1876.

Prime Minister speech delivered at the Scheduled Tribes Conference, New Delhi, 7th June, 1952, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi

Prasad, Binod Mohon, Santal Parganas, Tenancy Manual, Malhotra Bros., 1995.

Prasad, Ranchor, Bihar District Census Hand Book (1951) : Santal Parganas, Printed by the Superintendent Government printing, Bihar, Patna, 1956.

Prasad, B.N., Revised working plan for the Santhal Parganas Division, 1955-56 to 1964-65, The Superintendent Government, Secretariat Press, Bihar, Patna, 1963.

Prasad, S.D., Bihar District Census Hand Book (1961) : Santal Parganas, 12, part-II, Village and Town Statistics, Published by the Government of Bihar, Patna 1964.

Report of the Santal Parganas inquiry Committee, Superintendent Government Printing, Bihar, Patna, 1938.

Report of The Committee on the Special Multi-Purpose Tribal Blocks, Ministry of Home Affairs, New Delhi, March, 1960.

Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission, 1960-61, Vol- I and II, Ministry of Home Affairs, New Delhi, 1963.

Report on the Forest Resources of Santal Parganas and Part of Bhagalpur Districts of Bihar, Forest Survey of India Eastern Zone, Ministry of Environment and Forest, Government of India, 1985.

Second Five-Year Plan in Bihar : A Review of Progress in the Second Year, 1957-58, Printed by the Superintendent, secretariat Press, Bihar, Patna, 1958.

Santal Parganas Manual (1911), Secretary to the Government of Bihar, Revenue Department, Patna, Reprint 1961.

Special Laws Applicable to the Santal Parganas, Government of Bihar Law Department, superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965.

The Santal Parganas Settlement Regulation (Regulation No.III of 1872) as Modified up to the 1st October 1899, The Superintendent of Government Printing, Calcutta, 1899.

The Bihar and Orissa Forest Manual, Vol-I and Vol-II, Superintendent, Government Printing , Bihar, Patna, 1917.

Third Five-Year Plan in Bihar, Vol-I, Printed by the Superintendent secretariat Press, Bihar, Patna, 1961.

C. MISSIONARY RECORDS

The Thirty-Fourth Annual of the Santal Mission of the Northern Churches (The Indian Home Mission to the Santal), 1900-1901, Benagaria, 1901.

The Forty-Fifth Annual Report of the Santal Mission of the Northern Churches (The Indian Home Mission to the Santal), 1911-12, Benagaria, 1913.

The Fifty-First Annual report of The Santal Mission of the Northern Churches (The Indian Home Mission to the Santal), 1917-18, Published by the The Santal Mission of the Northern Churches, Dumka, 1919.

The Seventy-Sixth Annual of the Santal Mission of the Northern Churches, 1942, Benagaria, 1943.

The 91st Annual of the Santal Mission of the Northern Churches for the year 1957 and the Eighth year of the Ebenezer Evangelical Lutheran Church, Dumka, Published by the Santal Mission of the Northern Churches, Benagaria, 1958.

D. FIELD WORK IN THE SANTAL PARGANAS (Now at Jharkhand)

সাক্ষাৎকার, সাগেন মারান্ডি, সিমলাডাঙ্গাল, জামতাড়া, ঝাড়খন্ড, ০৯.০৮.২০২২

সাক্ষাৎকার, সুলখান সরেন, মিরগাপাহাড়ি, জামতাড়া, ঝাড়খন্ড, ১২.০৮.২০২২

সাক্ষাৎকার, ফুলমনি টুডু, তেলিয়াবাঁধি, জামতাড়া, ঝাড়খন্ড, ২০.০৮.২০২২

সাক্ষাৎকার, সন্তোশ টুডু, নেতারপাহাড়ি, দুমকা, ঝাড়খন্ড, ২৫.০৯.২০২২

সাক্ষাৎকার, নমিতা কিস্কু, লহরজুড়ি, দেওঘর, ঝাড়খন্ড, ২৫.১১.২০২২

পর্যবেক্ষণ : জামতাড়া, দুমকা, দেওঘর, গোড্ডা, তারিখ. ১৭.০৫.২০২১-২০.০৬.২০২১.

পর্যবেক্ষণ: চুটোনাথ মন্দির, দুমকা, ঝাড়খন্ড, তারিখ – ৭.১২.২০২১.

পর্যবেক্ষণ : (সিমলাডাঙ্গাল, তেলিয়াবাঁধী, জোডডিহা, দুমা, ভিমপাহাড়ি), জামতাড়া জেলা, ফতেহপুর ব্লক, ঝাড়খণ্ড, তারিখ – ১০.০২.২০২১ -২১.০২.২০২১।

SECONDARY SOURCES

1. English Books :

Adhikary, Ashim Kumar, The Tribal Situation in India, Abijeet Publications, Delhi, 2009.

Archer, W.G., Tribal Law and Justice, Concept Publishing Company Pvt. Ltd., New Delhi, First Published 1984, Reprinted 2014.

Banerjee, Prathama, Politices of Time: 'Primitives' and History - Writing in a Colonial Society, Oxford University Press, Delhi, 2006.

Banerjee, Tarasankar, Changing Land Systems and Tribals Eastern India in The Modern Period, Subarnarekha, Calcutta, 1989.

Biswas, P.C., Santals of the Santal Parganas, Bharatiya Adimjati Sevak Sangha, Delhi, 1956.

Bodding, P.O, Traditions and Institutions of the Santals, Gyan Publishing house, New Delhi, Frist Published 1942, Reprint 2013.

Bodding, P.O., Studies in Santal Medicine and Connected Folklore,(Part-i,ii,and iii), Gyan Publishing House, New Delhi, , Frist Published 1925, Reprint 2017.

Bompas, C.H., Folk Lore of the Santal Parganas, David Nutt, London, 1909.

Bose, Nirmal Kumar, Hindu Method of Tribal Absorption, Science and Culture, Delhi, 1941.

Bose, Nirmal Kumar, Tribal Life in India, National Book Trust, New Delhi, 1971.

Bradley-Birat, F.B., The Story of an Indian Upland, Smith, Elder and Co., London, 1905.

Carstairs, R., Harma's Village-A Novel of Santal life, The Santal Mission Press, Pokhariel, 1905.

Carstairs, R., The Little World of an Indian District Officer, Macmillan and Co., London, 1912.

Chakraborti, Digambar, History of The Santal Hool of 1855, in Arun Chowdhury (ed.), National Book Agency (P) Ltd., Calcutta, 1989.

Culshaw, W. J., Tribal Heritage: A Study of the Santals, Gyan Publishing House, Frist Published 1949, Reprint 2013.

Datta, K.K., The Santal Insurrection of 1855-57, Firma KLM Private Limited, Calcutta, 2001.

Guha, Ramachandra, Savaging The Civilized : Verrier Elwin, His Tribals, and India, Penguin Random House India, Haryana, 2016.

Hembrom, T., The Santals, Punthi Pustak, Calcutta, 1996.

Man, E.G., Sonthalia and the Sonthals, Geomyman and Co., Calcutta, 1867.

Methur, Nita, (ed), Santal Worldview, Concept Publishing Company, New Delhi, 2001.

2. English Articles in Journals:

Banerjee, Prathama, 'Writing the Adivasi : Some Historiographical notes', in Indian Economic and Social History Review, Vol.LIII, no.1, January-March, 2016.

Basu, Sunil Kumar, 'Identity Crisis Among the Tribals', in Bulletin of the Cultural Research Institute, Vol.XVIII, No.1-2, 1992.

Basu,K.K., ' Missionary Education in the Sonthal Parganas', Journal of the Bihar Research Society, Ranchi, 30(2), 1944.

Bodding, Paul Olaf, 'The Santals and Disease', Memories of The Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 10(1), 1925.

Campbell, Andrew, 'Death and Cremation Ceremonies among the Santals', Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Patna, 2(4), December, 1916.

Chattopadhyay, K.P., 'Santal, Migration', Proceedings of the 31st Indian Science Congress, Delhi, 1994.

Choudhary, Binay Bhushan, 'Revaluation of Tradition in the Ideology of the Radical Adivasi Resistance in Colonial Eastern India, 1855-1932', in Indian Historical Review, Part.I, 36,2,2009.

Das, Victor, 'Jharkhand Movement: From Realism to Mystification', in Economic and Political Weekly, Vol.25, No. 30, Jul.28.1990.

Gadgil, Madav, 'Sacred Groves : An Ancient Tradition of Nature Conservation', in Scientific American, December 1, 2018.

Ghosh, Arunabha, 'Probing the Jharkhand question', in Economic and Political Weekly, Vol.26, No.18, May 4, 1991.

3. Bengali Books:

বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ, আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০৯।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, সুবর্ণরেখা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, সাঁওতাল গণসংগ্রামে নারী সমাজের ভূমিকা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০৬।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, অষ্টম প্রকাশ ২০১৩ ।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, অষ্টম প্রকাশ ২০১৬।

ভাদুড়ী, পাঁচুগোপাল, ভগনাদিহির মাঠে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৫।

মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ, জঙ্গলমহল ও ঝাড়খন্ড লোক দর্শন, পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৪

মিত্র, স্বর্ণ, দামিন-ই-কো'র ইতিকথা, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৩।

মিদ্দে, ড. সুরঞ্জন, সাঁওতাল ও মিশনারি, নান্দনিক, কলকাতা, ২০১৮।

মিশ্র, শিবেন্দুশেখর, সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭।

সিকদার, সুকুমার ও সারদা প্রসাদ কিস্কু (অনুবাদ ও সম্পাদনা), খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি : সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতির আদিগ্রন্থ, নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৭।

সেন, শুচিব্রত, পূর্ব ভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সঙ্কট, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।

হেমব্রম, পরিমল, আদিবাসী স্বাধীনতা সাংগ্রামীদের কথা, আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, ২০১৮।

হেমব্রম, পরিমল, ঝাড়খন্ডের ইতিহাস, সাহিত্যম প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৮।

হেমব্রম, পরিমল, সাঁওতালি ভাষা-চর্চা ও বিকাশের ইতিবৃত, নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০।

হেমব্রম, পরিমল, সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে সাঁওতালি ভাষা আন্দলেনের ইতিহাস, আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, ২০১৭.

4. Bengali Journals :

অনুষ্টুপ, আদিবাসী ভারত বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ৪, সম্পাদক, অনিল আচার্য, প্রাক্ শারদীয় ২০২২।

কোরক, পরাধীন ভারতের বিদ্রোহ, সম্পাদক, তাপস ভৌমিক, শারদ ২০২১।

পরিকথা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বার্ষিক পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, সম্পাদক, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, ডিসেম্বর, ১৯৯৯।

পশ্চিমবঙ্গ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ২-৬, সম্পাদক, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, ১৪, ২১, ২৮ জুলাই ও ৪, ১১ আগস্ট ১৯৯৫।

স্বদেশচর্চা লোক, প্রান্তবাসী : সমাজ-সংগ্রাম-সংস্কৃতি, সম্পাদক, প্রনব সরকার, শারদ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৮।

5. Santali Books:

কিস্কু, বুধন, খেরওয়াল হপন কোওয়াঃ সিরজন কৌহ্নি, প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ২০০২।

বেসরা, দময়ন্তি, সানতাড়ি সাঁওহেদ রেয়া নাগাম, রয়্যাল পাবলিকেশন, ২০১২।

মুরমু, রামেশ্বর, জাহের বঙ্গা সান্তাড় ক, আদিম পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০১।

হাঁসদা, কানাইলাল, খেরওয়াল বিরৌদালি কোওয়াঃ মারেন নাগাম, আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, ২০০৮।

হেমব্রম, নিন্তানন্দ, খেরওয়াড় কয়াঃ ঔরিচৌলি আর রৌয়রিত রেয়াঃ তেতেদ, লিখন গড়হন, ঝাড়গ্রাম, ২০০৯।

হেমব্রম, নিন্তানন্দ, খেরওয়াল সাঁওনতা রেয়াহঃ নাগাম, মার্শাল বাম্বার, ঝাড়গ্রাম, ২০১২।

6. Santali Journals:

Nonol Tiryo, Vol.I, Issue.I, Editor, Pradhan Murmu, Apr-Jun, 2019.

Sarjom Umul, Vol.8, Issue No.10, Editor, Ganesh Marandi, Oct-Nov-Dec, 2021.

Sarjom Umul, Vol.8, Issue No.4, Editor, Ganesh Marandi, Oct. to Dec. 2018.

Sibil, Vol.I, Issue No.III, Editor, Sanat Kumar Hembram, Apr to June, 2009.

Umul, Vol.19, No.3-4, Editor, Binay Kumar Soren, Jul-Dec, 2021.

7. Hindi Books :

দীনেশ, বী, এন, সান্তাল পরগণা ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও সংস্কৃতি, প্রথম ভাগ, একাডেমিক ফোরাম, দুমকা, ২০০৪।

সোরেন, ইংরেজ, ইতিহাস কে আইনে মে সান্তাল পরগণা, বীণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, দুমকা, ২০১৪।

8. Online Sources:

http://www.jstor.org

http://www.tribalzone.nct/history/santhal.htm

http://www.tribalzone.net/history/santhal.htm

http:/archive.org

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Damodar_Valley_Corporatio,

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Five-Year_Plans_of_India.

https://indiankanoon.org/search/?formInput=AIR%201974%20+doctypes :patna,

https://www.ideasforindia.in/topics/governance/land-disputes-in-santhal-parganas-issues-and-solutions.html